তারিখ 14-DEC 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি তদন্ত কমিশন রিপোর্ট ও গণতন্ত্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা, সএমনকি সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও রিপোর্টটির উপর কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়নি। রিপোর্টটি কার্যকর করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিরও কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। অথচ প্রায় একবছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ অথবা অচল হয়ে আছে। সিনেট সিণ্ডিকেট, একাডেমী কাউন্সিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদের সভা স্থগিত হয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে উপাচার্য বা তার প্রতিপক্ষ দল কারো ভ্রূক্ষেপও নেই। ক্ষমতা না ছাড়ার ব্যাপারে উপাচার্য যেমন অনমনীয়, তেমনি তাঁকে ক্ষমতায় না রাখার ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষরাও বদ্ধপরিকর।

হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আন্তরিক কোন উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ইতিহাসের কাছে অবশ্যই এজন্য আমরা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকব। আগেই বলেছি, এ রিপোর্ট নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়েছে, এর বিরূপ সমালোচনায় অনেক লেখাও বেরিয়েছে তবে এসব লেখা বা সমালোচনা করার আগে ৩০৪ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ রিপোর্টটি কেউ আদ্যপান্ত পাঠ করেছেন কি না তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এ ব্যাপারে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (প্রাক্তন) বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক প্রনিধানযোগ্য সাথে এক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন অনেকে না বুঝেই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা করছেন বা অপব্যাখ্যা করছেন। আর তার সাথে আমি যোগ করে বলতে চাই যে, অনেকে রিপোর্টটি না পড়েই বা আংশিক পড়ে তা করেছেন।

২২ ডিসেম্বর ৯০-এর ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ

১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত একটি সহিংসে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের অপসারণের দাবী থেকেই এই বিবাদের সূত্রপাত। এখানে মনে রাখা দরকার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট, চাকসু, আপস, চ, বি শিক্ষক সমিতি এবং ছাত্র শিবির ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনসহ প্রায় সকল মহলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়। এদিকে ২২ ডিসেম্বরের ঐ ঘটনা সম্পর্কিত ভাবাবেগ ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের রেশ যখন কমে যেতে থাকে এবং বিষয়টি নিয়ে সবাই যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে শুরু করে তখন ঘটনার প্রকৃত চেহারা ও বিভিন্ন মহলের ভূমিকার সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসতে লাগলো। উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের দাবীতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল কিন্তু তখন ধর্মঘট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও এমন ঘটনাতো আর কোথাও ঘটেনি। একদল ধর্মঘট বা হরতালের ডাক দিলে আরেকদল তো কখনো বাধা দেয়নি। অন্যান্য জায়গার মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এটা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল এবং আমরা শিক্ষকরাও কোন সময় জোর করে ক্লাস নিতে যাইনি। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর হঠাৎ এই বাধাদানের প্রশ্ন কেন আসলো?

কমিশনের নিকট শিক্ষকগণ কী বলেছেন?

কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকারী ছাত্র, শিক্ষক অন্যান্যের মধ্যে দু'পক্ষের মিলে প্রায় ৯০% স্বীকার করেছে যে, মিছিল নিয়ে কলা ভবনের গেটের দিকে যাওয়ার সময়ই সংঘর্ষ শুরু হয়। উপাচার্যের সমর্থনকারী গোলাপী প্যানেলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান (তদন্ত কমিশন রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬), অধ্যাপক ফজলে হোসাইন (পৃঃ ৯১-৯৪), অধ্যাপক অনুপম সেন (পৃঃ ৮২-৮৫) সহ অন্যান্যের বক্তব্যের মধ্যে এসব কথাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এসেছে। তাছাড়া ঘটনার একদিন আগে অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর সাধারণ শিক্ষকদের নামে গোলাপী দল সভা করে ২২ তারিখের ধর্মঘটের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সম্পর্কে অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান বলেছেন, "we decided to take classes as usual" এবং অধ্যাপক ফজলে হোসাইন বলেছেন, "we decided to resist the stripe" অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্মঘট প্রতিহত করার সিদ্ধান্তও তারা নিয়েছেন আবার প্রতিহত করতে গিয়ে যে সংঘর্ষ শুরু হয় এটাও তারা অস্বীকার করেননি। রিপোর্টে দেখা যায়, অধ্যাপক হোসেন কলা ভবনের গেটের সামনে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সময় চাকসু ভিপির নিকট শিবিরের সভাপতিকে বলতে শুনেছেন, "আপনার সাথে তো এরকম কথা ছিল না।" অর্থাৎ ধর্মঘট বিরোধীরা শুধু শহীদ মিনারের কাছে শান্তিপূর্ণ বা মৌন মিছিল করে ফিরে যাবে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে শিবির ও চাকসু-এর মধ্যে চুক্তি হওয়ার পরই গেট খুলে দেয়া হয়, ফ্যাকাল্টি ভবনে প্রবেশ করার কথা ছিল না। এদের কথা না হয় বাদ দিলাম স্বয়ং উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিন কি বলেছেন (পৃঃ ১৫৪-১৫৭) এবার তা একটু দেখা যাক। তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "Had the teachers and the students not taken steps in entering into the campus for their classes on 22.12.90, there would not have been any painful occurrence that took place on that day"

উপাচার্যের এই কথা থেকে কি সংঘর্ষের কারণটা আরেকবার পরিষ্কার হয়ে যায় না আর তিনি নিজেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী। তবে একথা বলে তিনি হয়তো কমিশনকে এটাও বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তার পদত্যাগের দাবীকে গ্রহণ না করে সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস করতে এসেছিলেন। কিন্তু অনেক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের বলা হয়েছে শুধু শান্তিপূর্ণ মিছিলের মাধ্যমে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে তারা চলে আসবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে তালা ভেঙ্গে ফ্যাকাল্টিতে ক্লাস নিয়ে ধর্মঘট প্রতিহত করার গোপন পরিকল্পনার কথা তাদের বলা হয়নি। এ কারণে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মাহবুবুল্লাহ, অধ্যাপক আফতাব আহম্মদ, ডঃ শিরীন হক, গোলাম মোস্তফা, আবুল হোসাইন ভুইয়া প্রমুখসহ বেশ কিছু প্রগতিশীল শিক্ষক যাদের অনেকেই সেদিনের ঘটনায় আহত হয়েছিলেন, তাঁরা পরে উপাচার্যপন্থী কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রনেতার এই গোপন ও হঠকারী সিদ্ধান্তের নিন্দা করে উপাচার্যের অন্ধ সমর্থনে পরিচালিত তাদের আন্দোলন থেকে সরে

বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত

এবার দেখা যাক তদন্ত কমিশন রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর ব্যাপারে যে সুপারিশ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে উপাচার্যপন্থী শিক্ষকগণ কেন এতো সোচ্চার হলেন? বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এবং বিশেষ করে ঢাকা প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে তারা এই রিপোর্টকে বিশ্ববিদ্যালয় অইন '৭৩ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বভৌমত্ব হরণ এবং উপাচার্যকে অপসারণ করার একটা গভীর চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন।

যদি ধৈর্য ধরে পুরো রিপোর্টটা পড়ে থাকেন তাহলে তাদের নিজেদেরই লজ্জা পাওয়ার কথা। কারণ এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই কমিশনের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় আইন ৭৩-এর সমালোচনা করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হওয়া, শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, অতিরিক্ত নির্বাচনের জন্য লেখা পড়ার ক্ষতি ইত্যাদির জন্য এ্যাক্টের সমালোচনা করে তার পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য মতামত ব্যক্ত করেছেন। অথচ পরবর্তীতে সভা-সমিতিতে বলেছেন উল্টো কথা এবং দোষারূপ করেছেন তদন্ত কমিশনকে। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, গোলাপী দলের, প্রবীনতম শিক্ষক অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান বলেছেন "Time has come for amending the university Act 1973" আর দলের দু'নম্বর ব্যক্তি অধ্যাপক ফজলে হোসাইন বলেছেন, "The system of selection of a Vice Chancellor should be modified and changed as this gives rise to groupings amongst the students and the teachers and teachers should not take any direct or indirect part in the students politics or in the national politics" (পৃঃ ৯৪) লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো তুলনামূলকভাবে উপাচার্যের বিরোধী ক্যাম্পের শিক্ষকগণ এ্যাক্ট

হায়াত হোসেন

পরিবর্তন সম্পর্কে কম বলেছেন যতটা না বলেছেন তার পক্ষের লোকেরা। নিষেধ করে যারা পরে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে ... বিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন। ... দেখা যাক উপাচার্য অধ্যাপক ...গীর সিরাজুদ্দিন এ ব্যাপারে কি ...। তিন বলেছেন "Several ...ons of the University Act, ...ve created certain problems ... smoothe functioning and ... of the University and they ...ecessary amendment" (পৃঃ ...) ...চার্য নিজেই যদি একথা বলেন বা ঐ... অনুভব করেন তাহলে আর অন্যদের বিশেষ করে তার সমর্থকদের সম্পর্কে আর কি বলা যায়। এখন কেউ যদি বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের smoothe functioning-এর জন্য একজন বিতর্কিত উপাচার্যকে অপসারণের provision এ্যাক্টে থাকতে বা আনতে হবে (যা এখন নেই) সেই যুক্তি খণ্ডন করার কোন উপায় আছে কি? তবে এ্যাক্ট সংশোধনের মতামতটি দলমত নিরপেক্ষভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায় এবং অনেক নিরপেক্ষ শিক্ষকও এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। যেমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম বলেছেন, "The concerned authority should consider seriously the method of selecting the Vice Chancellor. The teachers of the University should not take any direct or indirect part in the student politics or in the politics of the country and there should be a written code of conduct for the teachers of all University"" (পৃঃ ১১৮)।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকারী অধিকাংশ শিক্ষকই কোননা কোনভাবে এ্যাক্টের সংশোধন চেয়েছেন এবং এতে নিশ্চয়ই অন্যায়ের কিছু নেই। ১৯৮৭ সালের প্রথমদিকে দৈনিক সংবাদ-এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন এত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী সংশোধনী আনার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালে জনৈক তারেক বিন ফজলের লেখা 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭০ ও শিক্ষকদের ভাবনা" নামক একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থে দেখা যায় ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির প্রায় সব শিক্ষকই এ্যাক্টের কিছু না কিছু সংশোধন চেয়েছেন।

একজন বিতর্কিত ও অবিবেচক শিক্ষাবিদ যা একটি সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ —এর প্রণেতারা এ্যাক্টে উপাচার্যের অপসারণের কোন ধারা রাখেননি হয়তো একারণেই যে, এমন সম্মানিত পদের অধিষ্ঠিত একজন শিক্ষাবিদকে অপসারণ করার ... তিনি সসম্মানে সরে ...

জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তাদের নিয়ে সৃষ্ঠ বিতর্ক ও সরকারী মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং সরকারই তাঁদের অন্যত্র সম্মানজনক পদে বহাল করেন। তবে সরকার চাইলে একজন উপাচার্যকে যথেষ্ট হেনস্থা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের পরপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চাকুরিচ্যুত ও কারাবদ্ধ হন। এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন ছিল তাও নয়। তবে সবচেয়ে অপমানজনকভাবে উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত হন ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক আলী আহসান ও ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেম হুদা। উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান যখন ভারতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপাচার্য হিসাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখনই বাংলাদেশ বেতার ও আকাশবাণীর খবরে শোনা যায় তিনি উপাচার্য পদ থেকে ইতোমধ্যে অপসারিত এবং এ কাজটি করার আগে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে একটি কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করেননি। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হুদাকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ অপসারণ করেন স্থানীয় একজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে। তাঁকে জেলে পাঠান হয় এবং তাঁর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ডঃ হুদাকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ অপসারণ করেন স্থানীয় একজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে। তাঁকে জেলে পাঠান হয় এবং তাঁর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এসবের তুলনায় বর্তমান সরকার তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে অনেক সভ্য আচরণ করেছেন। তদন্ত কমিশনের রির্পোটের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাঁকে সসম্মানে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছেন এবং অন্যত্র ভালো পদে বহাল করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি এটা না করে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করলেন, চট্টগ্রামে একদিন হরতাল করালেন, শহরের একটি কলেজে বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় চালু করাবার প্রহসন করলেন, নিজে ক্যাম্পাস থেকে সরে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। এসব কি একজন উপাচার্যের জন্য সম্মানজনক কাজ? বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ৭৩ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় অন্য আইন আছে যা দিয়ে সরকার একজন উপাচার্যকে অপসারণ করতে পারেন। কিন্তু এতো কিছুর পরও সরকার তা করেননি, বরঞ্চ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী আরো একজন মন্ত্রী ও চট্টগ্রামের মেয়রসহ উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়েছেন তিনি যদি সসম্মানে পদত্যাগ করেন তাঁকে অন্যত্র ভালো পদ দেয়া হবে যদিও জুডিশিয়াল কমিশন কর্তৃক দোষী কোন ব্যক্তিকে এভাবে পুরস্কৃত করা ঠিক নয়।

উপাচার্যকে তার মান-সম্মান বা আত্মসম্মান সম্পর্কে বোঝাতে হচ্ছে অন্যদের এসে, তাতেও কাজ হচ্ছে না। এখন কি বলা যায় যে, শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন সম্পর্কে উপাচার্যের সামান্যতম সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ বা বিবেচনা আছে যেখানে তার জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ... বছর ধরে অচল হয়ে আছে? সন্ত্রা... ...আলাদা। চোরা না শুনে ধর্মের কা... তাদের কাছে আবেদন নিবেদন ক... তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে ...

এ সরকার যে তা এখন করবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক কারণ যে উপাচার্য তাদের কথা শুনছেনা তাঁকে কেন সরকার সাহায্য করবে?

সরকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য

তদন্ত কমিশনের নিকট সরকারী কর্মকর্তাগণ যে বক্তব্য রেখেছেন তাও বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। এরা কেউ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির সাথে জড়িত নয় কিন্তু এদের বক্তব্য কেন উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে গেল। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব এ আর খানসহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে হাটহাজারী থানার দারোগাকে নিয়ে প্রায় দশ জন যে বক্তব্য রাখেন তাতে দেখা যায়, ২২ ডিসেম্বর এবং তার আগে ও পরে পুলিশী তৎপরতায় যদি কোন ঘাটতি থেকে থাকে তার জন্য তারা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথা উপাচার্যকে দায়ী করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তারা বিভিন্ন নথিপত্রও উপস্থাপন করেছেন। তবে জেলা প্রশাসকের দীর্ঘ বক্তব্যের এক জায়গায় উপাচার্যের এরশাদ প্রীতির প্রমাণটাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর ২৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইমার্জেন্সী ঘোষণা করে সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি থেকে শিবির কর্মীরা না যাওয়ায় উপাচার্য বার বার ডিসি-এর উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন ওদেরকে বের করে সরকারী নির্দেশ কার্যকর করার জন্য। পরে মন্ত্রী আনিস-বাবলুর হস্তক্ষেপে এর একটি মীমাংসা হয়। তবে জেলা প্রশাসকের মতে "This incident created a doubt in the mind of the shibir sindluts abant the attitnde of the Vice-Chaucellor, (পৃঃ ১৯৫)

উল্লেখ্য যে, একই সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে সহযোগিতা, ডিসেম্বরের শেষ দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা মালা ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখা, গায়েবী জানাজায় শরীক না হওয়া, আন্দোলনের স্বপক্ষে পদত্যাগ করার জন্য শিক্ষক সমিতির অনুরোধ প্রত্যাখান করা ও তাদের অপমান করায় অভিযোগে উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরজুদ্দীনের পদত্যাগ দাবি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনও তা অনুমোদন করে। এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠে যে, আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যখন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাগণ শহরে এরশাদ বিরোধী শিক্ষক সমাবেশ ও মিছিল করার আয়োজন করে উপাচার্য পন্থী বেশ কিছু শিক্ষক তাতে বাধা প্রধান করে এবং তারা সমিতি কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষকদের যৌথ পত্যাগের ব্যাপারটি মিথ্যা ও প্রহসনমূলক বলে সাংবাদিকদের জানায়। অবশ্য এরশাদের পতনের সাথে সাথে এদেরই ৪৫ জন পত্রিকায় তড়িগড়ি করে এক বিবৃতি দিয়ে এরশাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের জন্যে জনগণের প্রশংসা করেন ও তাদের অভিনন্দন জানান।

এতো কিছুর পরও আমরা এখন কিভাবে তদন্ত কমিশনকে দোষারোপ করি? শুধু একটি বিষয়ে কমিশন বা মাননীয় বিচারপতি মতামত ব্যক্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং সেটা হলো ফারুকুজ্জামান নামক ছাত্রটির হত্যাকারী কে? এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হলো, বিষয়টি হাটহাজারী থানার তদন্তাধীন এবং হাটহাজারী উপজেলা কোর্টে মামলাধীন (Case No. 12 of 90) এবং case No 145 of 90) অতএব সাব-জুডিস।

অতএব, চ্যান্সেলরকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিশন একজন নিরপেক্ষ উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। অথচ এদিকটা উপাচার্য পন্থীরা না দেখার বা না পড়ার ভান করছেন। (অবশ্য আমার বিশ্বাস তারা পুরো রিপোর্টটি পড়েননি) এবং অভিযোগ করছেন যে, কমিশন শিবিরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।

এ অবস্থা হলে বিচারপতিরা কি আর কোনদিন এধরনের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন? অথচ একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন ...